মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ.

আলিম সমাজের প্রতি

নসীহাহ

অনুবাদ : মাওলানা মিজানুর রহমান

সম্পাদনা : মুফতি হারুন ইজহার

ফয়জিয়া কুতুবখানা

সম্পাদনা : মুফতি হারুন ইজহার
অনুবাদ : মাওলানা মিজানুর রহমান
প্রকাশক :
মাওলানা জুবাইর হোসাইন ফয়জী
ফয়জিয়া কুতুবখানা
প্রথমপ্রকাশ : জানুয়ারি ২০২০
দ্বিতীয়সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২১
মূল্য : ৮০ টাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

তা। হ। মি। দ

[ক]

কওমি-দেওবন্দি ধারা শেষ জমানায় ইসলামের অনন্য সুরক্ষিত দুর্গ। এটি একটি বরকতময় কাফেলা, যার কান্ডারিরা নব্য জাহিলিয়্যাহর নিকশ আঁধারে সালাফের বিশুদ্ধতাকে তারার মতো দিগন্তে জ্বালিয়েছে।

শুধু উপমহাদেশীয় পরিমণ্ডলে নয়, বৈশ্বিক পরিসরেও ইসলামের শ্বাশত নির্ভেজাল চেতনায় জগদ্বাসীকে আন্দোলিত করেছে এই সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশুদ্ধবাদী আন্দোলন। শেষজমানায় খোরাসানে ইসলামের বিজয়ের ইঙ্গিত আছে মহানবী সা. 'র বাণীতে, এই তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়ের শিরোপাধারী হলো এই নিরীহ কাফেলা।

দেওবন্দি ওলামা সমাজের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসও বর্তমান ভূমিকা আধুনিক ও সমকালীন পর্যালোচনার এক অনস্বীকার্য পাঠ, যে পাঠ ছাড়া জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সামাজিক রাজনৈতিক বোঝাপড়া অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়।

নিরীহ বৈশিষ্ট্য, সামাজিক চরিত্র, আধ্যাত্মিক গুণ ও বৈপ্লবিক চেতনার এক দ্বান্দ্বিক সময়ে পরিচালিত এই স্কুল অব থ্যট আধুনিক সিস্টেমের প্রগতিশীল গড্ডলিকাপ্রবাহ থেকে কীভাবে

নিজেকে মুক্ত রেখে ইসলামের সত্যিকার ঐতিহ্যকে ধারণ করে রেখেছে তা বিস্ময়কর এক বাস্তবতা।

তথাকথিত প্রগতিশীল লিবারেল জীবনদর্শনের আধুনিক সেক্যুলার ব্যবস্থার লাগামহীন দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে দেওবন্দ-আন্দোলন এক অপ্রতিরোধ্য সামাজিক চ্যালেঞ্জ।

দেওবন্দি আন্দোলনের অন্যতম সেরা মুখপাত্র হযরত মাওলানা কারী তাইয়িব রহ. তাঁর রচিত বই ‘ওলামায়ে দেওবন্দ কি দীনী রুখ আওর মাসলাকি মেযাজ’ গ্রন্থে চমৎকারভাবে এ আন্দোলনের গতি ও চিন্তাধারা বিবৃত করেছেন।

ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওবন্দ আন্দোলন মুসলিম সমাজকে সীমালঙ্ঘন ও ছাড়াছাড়ির দুই বিপজ্জনক প্রান্তিকতার খপ্পর থেকে রক্ষা করে ওয়াসাতিয়্যাহ বা মধ্যপন্থার পথ প্রদর্শন করেছে, যেই ওয়াসাতিয়্যাহ নবীজির আদর্শ থেকে উৎসারিত, ঐ মধ্যপন্থা নয়, যা বিজাতীয় মডারেট প্রকল্প অথবা স্বজাতীয় হীনম্মন্যতার সাথে যায়।

সুফীতত্ত্ব ও মরমিবাদ থেকে নানা কুসংস্কার ও শিরককে অপসারণ, মাযহাব অনুসরণের সকল ঐতিহ্যকে সুন্নাহভিত্তিক পাঠ দ্বারা সুসজ্জিতকরণ, রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামের শূন্যস্থান পূরণ, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রণোদনা, শাসকগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে নসীহার পাশাপাশি আপসহীন অবস্থান এরকম বহু বৈশিষ্ট্য দ্বারা এ আন্দোলন বিশেষিত।

সমকালীন দুনিয়ার কর্ম ও অবদানে ব্যাপকতার স্বাক্ষর এরমত আর কোনো জামাত রাখতে পারেনি।

[খ]

দেওবন্দ আন্দোলন একটি সংস্কারবাদী কাফেলা হওয়া সত্ত্বেও কালের আবহে তাতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে এমন সব কালচার, যা নববী মানহাজের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ নয়। আকিদাহর মৌলিক বিচ্যুতি না ঘটলেও অপ্রয়োজনীয় বিদআতে হাসানার রাহুগ্রাস থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্ত থাকেনি ইসলামের স্বচ্ছ এ ধারাটি।

মূলত দেওবন্দ আন্দোলন ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে দখলদার বিজাতীয় কুফফার অপশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের নিরস্ত্র দাওয়াতি সংস্করণ। শিক্ষাপ্রকল্পের মাধ্যমে দাওয়াহর সংগ্রামকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয় নতুন এ কার্যক্রমের মাধ্যমে।

অনুধাবন করার বিষয় হলো, আলিম সমাজের উক্ত শিক্ষা ও দাওয়াতি এজেন্ডা একটি অন্তর্বতীকালীন জরুরি ব্যবস্থা ছিল, যা দখলদার বৃটিশ পরাধীনতার গর্ভে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে চলমান ছিল। নিরঙ্কুশ সিলেবাস ও ইশতিহার এবং সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত চিন্তাভাবনার প্রশ্নে মৌলিকভাবে দেওবন্দ আন্দোলনের একক অবস্থান ছিল; কিন্তু ব্যাখ্যাগত বয়ান ও শাখাগত বিষয়ে বৈচিত্র্যের সুযোগে এমন কিছু অনুশীলন এখানে দৃশ্যমান হয়েছে, যা সালাফের বিশুদ্ধ মানহাজের বিচারে ক্রিটিক করার সুযোগ রয়েছে।

যেমন ইলমে মানতেক ও গ্রিক ফালসফার প্রয়োজনোর্ধ্ব পাঠ, সুফিবাদের বাড়তি কসরত, রাজনীতিতে গণতন্ত্র ইত্যাদি। এ

ছাড়াও ছিল প্রতিষ্ঠানিক রুসম-রেওয়াজের অধিক গুরুত্ব ও দাওয়াহবিমুখ আনুষ্ঠানিকতা। ছিল নসীহার স্থলে তার্কিক পদ্ধতিতে মুসলিম সমাজের বিদআত ও কুসংস্কার মোকাবেলার কিছুটা গলদ কৌশল।

বিশুদ্ধ তাওহীদের বিশ্বাস, সুন্নাহর অনুকরণ, ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা এবং তাআল্লুক মাআল্লাহ বা আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যগুলো সামনে রেখে শুরু হয় দেওবন্দ আন্দোলনের পবিত্র সফর।

যেহেতু এসব লক্ষ্য ছিল মহান, তাই এ কাফেলার মনীষীগণ নিজেদের মধ্যে প্রবিষ্ট বিচ্যুতি ও অনুপ্রবেশকারী পদস্খল নিয়ে কখনো নীরব থাকেননি। অন্যদের বলার সুযোগ না রেখে নিজেরা নিজেদেরক সালাফের মাপকাঠিতে বিচার করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সেই শীর্ষ শুরু ইমাম শাইখ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী থেকে হাকীমুল উম্মত ইমাম আশরাফ আলী থানবী, এবং সর্বশেষ বাংলাদেশে দেওবন্দিয়তের উজ্জ্বলতর নক্ষত্র মুফতি ফয়জুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহু) পর্যন্ত সকলেই আত্মসংস্কারের এ ফরীজা আদায় করে এই মোবারক জামাআতের হক্কানিয়াত এবং তার রব্বানিয়াত প্রমাণ করে গেছেন।

[গ]

বাংলাদেশের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ ফয়জুল্লাহ রহ. স্বভাবজাত ফিকহী প্রতিভার কারণে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণে সক্ষম হলেও তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি ছিল সংস্কারমূলক ইসলামি চিন্তা ও কর্ম। তিনি একদিকে ইমাম আনওয়ার শাহ

কাশ্মিরীর ইলমের উত্তরাধিকার লাভে ধন্য হয়ে বাংলাদেশে তাঁর ইলমি প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করেছেন, অন্যদিকে ইমাম মুজাদ্দিদে আলফেসানির মহান তাজদীদী শিক্ষা ও চেতনার ঝর্নাধারা থেকে তৃপ্ত হয়ে বাংলাদেশী মুসলিম সমাজের খরা ভূমিকে সে সংস্কারবাদী চেতনা দ্বারা সিক্ত করে সজীবতার পথ দেখিয়েছেন।

তাঁর ফিকহী রচনাগুলো নিরঙ্কুশ, তাঁর সংস্কারমূলক বয়ান দ্বর্থ্যহীন। আফেসাস, তিনি স্বয়ং আজ কওমী অঙ্গনে এক বিস্মৃত সত্তা। তাঁর চিন্তাধারাকে আজ নতুনভাবে জাগিয়ে না তুললে আমাদের জন্য থেকে যাবে আত্মঘাতী বিপর্যয়ের আরো অনেক হুমকি।

এ বইটি আলিম সমাজের বিষয়ে মুফতি ফয়জুল্লাহ র. এর সংস্কারমূলক কিছু রচনার সংকলন। এ ছাড়া তাসাওউফ সম্পর্কেও রয়েছে তাঁর সংস্কারমূলক কিছু রচনা। দ্বিতীয় ধাপে ইনশাআল্লাহ তা পাঠকের জন্য নিবেদন করবো।

আমার বয়স যখন দুই বছর তখন আমার বড় আব্বা মুফতি ফয়জুল্লাহ ইনতেকাল করেন। তাঁর চিন্তাধারা ও জীবনাচার সম্পর্কে আমি আমার নানি হযরতের বড় মেয়ে খ্যাতিমান আলিমা রহিমা খাতুন, তাঁর উত্তরসূরি দ্বিতীয় মুফতিয়ে আজম হযরত আহমদুল হক এবং আমার আব্বা মুফতি ইজহারুল ইসলামসহ হযরতের বিভিন্ন শিষ্য, আমাদের আরো কিছু মাশায়েখের কাছে জানার, বোঝার ও অনুসরণের চেষ্টা করি।

বইটিতে আমি শুধু সংকলনের এবং তারতীব অর্থে সম্পাদনার কাজ করেছি। হযরতের প্রতিটি বক্তব্যের হুবহু তুলে ধরা

হয়েছে, আমার পক্ষে কোনোরূপ ব্যাখ্যার সংযোজন করা হয়নি।

মাওলানা মিজানুর রহমান তরুণ প্রজন্মের উদীয়মান এক কওমী সম্পদ। অখ্যাত এসব তরুণ আগামী দিনে ইসলামের বিজয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংগ্রামী অবদান জানান দিবে আরো জোরালোভাবে, ইনশাআল্লাহ!

তিনি হযরতের এ লেখাগুলো অনুবাদ করে, আমাদের দাওয়াতি মিশনে অনন্য অবদান রেখেছেন। আল্লাহ তার জন্য তাওফীক আরো বাড়িয়ে দিক। আমীন।

আমরা একটি ক্রান্তিকালীন সময় পার করছি নিঃসন্দেহে। আলিম সমাজেরই একমাত্র কর্তব্য জাতির কান্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে সময়ের হাল ধরার চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করা।

আলিম সমাজের নেতৃত্বকে ভবিষ্যতের কঠিন সময়ে নিষ্কলুষভাবে যাতে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে উদ্দেশ্যে এ বইয়ের প্রকাশ।

হারুন বিন ইজহার

সূচিপত্র

ইজহারুল মুনকারাত/১৩
ইজহারুল খিয়াল/৩৯
দীনের আমানত ও খেয়ানত/৪৬
হক্কানি রব্বানি আলিমের কিছু আলামত/৫৩
মাদরাসার দায়িত্বশীলদের করণীয়/৫৬
শিক্ষাব্যবস্থায় অধঃপতনের জন্য দায়ী কে?/৫৯
দীনী মাদরাসার তালিবুল ইলম ও তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য/৬১
তালিবুল ইলমদের করণীয়/৬৪
প্রচলিত খতমসমূহ/৬৫
খতমে কুরআন/৬৫
খতমে দোয়ায়ে ইউনুস/৬৫
খতমে খাজেগান/৬৭
খতমে বুখারির হুকুম/৬৭
চিঠিপত্র/৬৮

ইজহারুল মুনকারাত

দীনী শিক্ষা-দীক্ষার উদ্দেশ্যে মাদরাসা-মকতব প্রতিষ্ঠা করা এবং বার্ষিক মাহফিলের আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের জমায়েত করে দীন ও শরিয়তের কথা প্রচারপ্রসার করা মুসতাহাব পর্যায়ের কাজ। ওলামায়ে কেরাম এসব পদ্ধতি ও আয়োজনকে বিদআতে হাসানাহ বলেছেন। একইভাবে ভালো কাজের স্বার্থে চাঁদা ওঠানো যদি তা বৈধতার শর্তানুযায়ী হয়– মুসতাহাব হতে পারে। কিন্তু শেষযুগে এসে দীনের এসব আয়োজন ও পদ্ধতির মাঝে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠাতাদের ইখলাস বরবাদ হয়ে গেছে। এমনকি অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতা মাদরাসা-মাহফিলকে জীবিকার উপকরণ ও পেশা বানিয়ে ছেড়েছে। পাঠদানের ক্ষেত্রে ছাত্রদের যোগ্যতার প্রতি শিক্ষকদের একদমই ভ্রুক্ষেপ নেই। অন্যদিকে নেসাব শেষ করাই যেন শিক্ষার্থীদের একমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। শতকরা দু'তিনজন যোগ্য ছাত্র বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। সকল স্তর অতিক্রম করে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করে ছাত্ররা মাদরাসা থেকে ফারিগ হয়ে যায়। অথচ বিশুদ্ধভাবে ইবারত পর্যন্ত পড়তে পারে না। ইবারতের অর্থ ভুল করে ফেলে। এভাবে

পড়ার চেয়ে না পড়াই উত্তম। এসকল ছাত্রকে পাঠদান করা মানে ইলমকে অপাত্রে অর্পণ করা।

তা ছাড়া ছাত্রদের দীনদারিও নষ্ট হয়ে গেছে। স্বাধীনমনস্কতা, নির্লিপ্ততা, জেদ ও একরোখা স্বভাব ছাত্রদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। মান্যতার গুণ তাদের স্বভাবে এখন আর নেই। অধিকাংশ অযোগ্য ও বদদীন শিক্ষক তালিম-তাদরিসের দায়িত্ব গ্রহণ করে বসে আছে। নিজের যোগ্যতার চেয়ে বড় কিতাব পড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লাগে। ফলে তারা এ হাদিসের বাস্তব নমুনাতে পরিণত হয়– "যখন দীনের কোনো বিষয় অযোগ্যদের দায়িত্বে অর্পিত হয়, তখন তোমরা কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো।"

অধিকাংশ শিক্ষক বদ-অভ্যাস ও অসৎ চরিত্রে লিপ্ত থাকে। অতঃপর তার অভ্যাস ও চরিত্রের প্রভাব ছাত্রদের মাঝে মন্দ প্রভাব ফেলে। অতিরিক্ত চা-পান খাওয়া, ধূমপান করা, অপচয় ও আরামপ্রিয়তা যেন ওলামা ও তলাবাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ ছাত্র বাজারে-মার্কেটে ঘুরে ফিরে। দোকানপাটে বখাটে ছেলেদের সাথে আড্ডাবাজি করে। অসৎ লোকদের সাথে চলাফেরা করতে সংকোচবোধ করে না। অথচ সকল আলিম ও তোলাবা এবং দীনের প্রতিনিধিত্ব করে এমন লোকদের উচিত অশালীন ও অশিষ্ট আচরণ থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকা। এমন কোনো আচরণ না করা, যা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের কারণ হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

আজকাল তো এমন সুযোগ্য ও দীনদার আলিম খুব কমই দেখা যায়, যারা শিক্ষকতার বহুমাত্রিক গুণে গুণান্বিত, যাদের প্রভাবে ছাত্ররা হেদায়াতের ছায়া খুঁজে পায়। কিন্তু ইদানীং মাদরাসার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। প্রায় মাদরাসায় আবার মিশকাত পর্যন্ত চালু আছে। কিছু মাদরাসায় তো দাওরায়ে হাদিসও চালু হয়ে গেছে। কিন্তু মিশকাত-দাওরার মতো উচ্চতর স্তরে পাঠদানের জন্য বহুমাত্রিক গুণবিশিষ্ট সুযোগ্য উসতাযের ব্যবস্থা তারা কীভাবে করবে? আছে কি সে পরিমাণ সুযোগ্য উসতায? নেই, ফলে দেখা যায় এসব গুরুত্বপূর্ণ দরসের দায়িত্ব অযোগ্যদের হাতে ন্যস্ত হয়। এদিকে প্রায় সময় মাদরাসার ওয়াকফকৃত সম্পত্তি অবৈধভাবে যত্রতত্র ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা হয়, যা সুস্পষ্টরূপে খেয়ানত। চাঁদা উত্তোলনের ক্ষেত্রেও বৈধতার শর্তগুলোর প্রতি একদমই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। দাতাদের অধিকাংশই স্বতঃস্ফূর্ততা ও ইখলাসের সাথে দান করে না। বরং তাদের দানে লৌকিকতাই মুখ্য থাকে। দাতার নাম ও দানের পরিমাণ ভরপুর মজলিসে প্রচার করা হয় এবং দাতার স্তুতি বর্ণনা করা হয়। স্বভাবত এটা দাতার অন্তরে আত্মতুষ্টি ও লৌকিকতা সৃষ্টি করে।

মাদরাসায় মাহফিলের উদ্দেশ্যই হয়ে গেছে প্রসিদ্ধি ও প্রদর্শনমূলক। দুনিয়াদারদের মাত্রাতিরিক্ত সম্মানপ্রদর্শন,

বিত্তশালীদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন, ফাসিক-ফাজিরদের গুণকীর্তন এসবই যেন আজকাল মাহফিলের নিয়ামক ও মৌলিক উদ্দেশ্য। মাদরাসার সুনামের জন্য মাহফিলে বাইরের প্রসিদ্ধ আলিম ও গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করা হয়। মাঝেমাঝে বিদেশি ভাষায়ও বয়ান করা হয়, যা প্রায় দুর্বোধ্য ও জ্ঞানগর্ভ হওয়ার কারণে মাহফিলের সাধারণ জনতা বুঝে উঠতে পারে না। তাদের এসব আয়োজনে ইখলাসের ছিটে-ফোঁটাও থাকে না। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসিদ্ধি ও অনুদান বৃদ্ধি করা ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য লক্ষণীয় নয়।

জনসাধারণের জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে মাহফিলে আলোচনা হয় না। বরং এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা সাধারণ মানুষ শুনলে বিভ্রান্তির শিকার হয়। ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধারণ মানুষের ভালোবাসার দাবি তো এটাই ছিল যে, এসব বড় বড় মাহফিলে, যেখানে নানা শ্রেণির মানুষের সমাবেশ থাকে, সেখানে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, যা সকলের জন্য উপকারী ও সময়োপযোগী হবে। কিন্তু ঘটছে তার উলটোটা। বেচারা আওয়াম নৈরাশ্য ও বিরক্তি নিয়ে ঘরে ফিরে। এটাও সত্য যে, উপস্থিত লোকদের অধিকাংশই ভালো নিয়ত নিয়ে মাহফিলে আসে না। বরং উৎসবের আমেজে আসে। তাই তারা উপকার থেকে বঞ্চিত হয়।

কোনো কোনো মাহফিলে বয়ান চলাকালীন চাঁদা উঠাতে থাকে, যা সম্পূর্ণ নাজায়েয। কারণ, এতে পঠিত

কোরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের অবমাননা হয়। শরিয়তের বিধান, কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের আলোচনার সময় নীরব থাকা ও মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা আবশ্যক। সে সময় অন্যকাজে ব্যস্ত থাকা জায়েয নয়।

এসব ওয়াজ-মাহফিল আজকাল উৎসব ও ওরসে পরিণত হয়েছে। বরং এসব মাহফিল যেন মাজারের ওরসপ্রথার মতো অনিবার্য বিষয় হয়ে পড়েছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও সচেতনতার অভাবে নিছক প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। যদিও এ সকল আয়োজনে বেশ কল্যাণ রয়েছে। এসব কল্যাণের স্বার্থে এ ধরনের আয়োজন বড়জোর মুসতাহাব হতে পারে। কিন্তু তাতে শরিয়তের খেলাফ এমনকিছু কর্মকাণ্ড প্রকাশ পায়, যার ফলে এসব আয়োজন প্রায় হারামের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

হাফেজদের পুরস্কার প্রদান এতোটা গুরুত্বহ হয়ে যায় যে, তার দশভাগের একভাগ গুরুত্ব দাওরা ও তাফসির বিভাগের ছাত্রদের ভাগ্যে জোটে না। অথচ আলিমদের শান ও মান হাফেজদের চেয়ে অনেক বেশি। তা ছাড়া যে সকল হাফেজের স্বজন ও অভিভাবক বিত্তশালী, তারই সাধারণত পুরস্কার পায়। আর যাদের অভিভাবক বিত্তশালী নয়, তারা খুব কমই পুরস্কার পায়। অথচ প্রায় দেখা যায় এই অবহেলিত হাফেজরাই অন্যদের চেয়ে যোগ্য ও দক্ষ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের বিষয় ছাড়াও ছাত্রদেরকে যে মানসিক কষ্ট দেওয়া হয়, তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।